سورة عبس

সূরা আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৪২ আয়াত, ১ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ۝١ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ۝٣ اَوْ يَذَّكَّرُ
فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا
يَزَّكّٰى ۝٧ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨ وَهُوَ يَخْشٰى ۝٩ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝١٠ كَلَّآ اِنَّهَا
تَذْكِرَةٌ ۝١١ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝١٢ فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝١٣ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝١٤ بِاَيْدِيْ
سَفَرَةٍ ۝١٥ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ۝١٦ قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ۝١٧ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ۝١٨
مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝١٩ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝٢٠ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝٢١ ثُمَّ
اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۝٢٢ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ۝٢٣ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ۝٢٤
اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۝٢٥ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۝٢٦ فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۝٢٧ وَّعِنَبًا
وَّقَضْبًا ۝٢٨ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۝٢٩ وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۝٣٠ وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۝٣١ مَّتَاعًا
لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝٣٢ فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ۝٣٣ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝٣٤
وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۝٣٥ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۝٣٦ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ
يُّغْنِيْهِ ۝٣٧ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝٣٨ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝٣٩ وَوُجُوْهٌ
يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝٤٠ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝٤١ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝٤٢

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (২) কারণ, তার কাছে এক অন্ধ আগমন করল। (৩) আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত, (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হত। (৫) পরন্তু যে বেপরোয়া, (৬) আপনি তার চিন্তায় মশগুল। (৭) সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। (৮) যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো (৯) এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, (১০) আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। (১১) কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবাণী। (১২) অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে কবূল করবে। (১৩--১৪) এটা লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ, পবিত্র পত্রসমূহ, (১৫) লিপিকারের হস্তে, (১৬) যারা মহত, পূতঃ চরিত্র। (১৭) মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ! (১৮) তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সুপরিমিত করেছেন তাকে (২০) অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন, (২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে। (২২) এরপর যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (২৩) সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি। (২৪) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। (২৫) আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি। (২৬) এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি। (২৭) অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, (২৮) আঙ্গুর, শাক-সবজি, (২৯) যয়তুন, খর্জুর, (৩০) ঘন উদ্যান, (৩১) ফল এবং ঘাস (৩২) তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (৩৩) অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, (৩৪) সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, (৩৫) তার মাতা, তার পিতা, (৩৬) তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। (৩৭) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। (৩৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, (৩৯) সহাস্য ও প্রফুল্ল। (৪০) এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত। (৪১) তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। (৪২) তারাই কাফির পাপিষ্ঠের দল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শানে-নুযূল ঃ এসব আয়াত অবতরণের কাহিনী এই যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিসে বসে কিছু মুশরিক সরদারকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাদের এই নামও বর্ণিত আছে—আবূ জাহ্‌ল ইবনে হিশাম, ওতবা ইবনে রবীয়া, উবাই ইবনে খলফ, উমাইয়া ইবনে খলফ। ইতিমধ্যে অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিছু জিজ্ঞেস করলেন। এই বাক্য বিরতিতে তিনি বিরক্তিবোধ করলেন এবং তার দিকে তাকালেন না। তাঁর চোখে-মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল। যখন তিনি মজলিস ত্যাগ করে গৃহে রওয়ানা হলেন, তখন ওহীর লক্ষণাদি ফুটে উঠল এবং আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হল। এই ঘটনার পর যখনই এই অন্ধ সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আসতেন, তখনই তিনি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন।—(দুররে মনসূর) আয়াতে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

পয়গম্বর (সা) ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং তাকালেন না। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। (এখানে অনুপস্থিত পদবাচ্যে বলা হয়েছে। এতে বক্তার চরম দয়া ও অনুকম্পা এবং প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে। কারণ, এতে প্রতিপক্ষকে মুখোমুখি দোষারোপ করা হয়নি। অতঃপর বিমুখতার সন্দেহ দূরীকরণার্থে উপস্থিত পদবাচ্যে বলা হচ্ছেঃ) আপনি কি জানেন যে (অর্থাৎ অন্ধ সাহাবী আপনার শিক্ষা দ্বারা) হয়তো (পুরোপুরি) শুদ্ধ হত অথবা (কমপক্ষে কোন বিশেষ ব্যাপারে) উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশে তার (কিছু না কিছু) উপকার হত। পরন্তু যে ব্যক্তি (ধর্ম থেকে) বেপ:রায়া আপনি তার চিন্তায় মশগুল হন। অথচ সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। (তার বেপরোয়া ভাব উল্লেখ করে তার প্রতি বেশী মনোযোগী না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে)। যে ব্যক্তি আপনার কাছে (দীনের আগ্রহে) দৌড়ে আসে এবং সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আপনি তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। [এসব আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর ইজতিহাদী ভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এই ইজতিহাদের উৎস ছিল এই যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগে সম্পাদন করাই সর্বজনস্বীকৃত। রসূলুল্লাহ্ (সা) কুফরের তীব্রতাকে গুরুত্বের কারণ মনে করেছেন। উদাহরণত যদি ডাক্তারের কাছে একজন কলেরা রোগী ও একজন সর্দিরোগী একই সময়ে উপস্থিত হয়, তবে কলেরা রোগীর চিকিৎসা অগ্রাধিকার পাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলার উক্তির সারমর্ম এই যে, রোগের তীব্রতা তখনই গুরুত্বের কারণ হবে, যখন উভয় রোগী চিকিৎসা প্রত্যাশী হয়। কিন্তু গুরুতর রোগী যদি চিকিৎসা প্রত্যাশীই না হয় বরং চিকিৎসার বিরোধিতা করে, তবে যে রোগী চিকিৎসা প্রত্যাশী সে-ই অগ্রাধিকার পাবে যদিও তার রোগ খুব হাল্কা হয়। অতঃপর মুশরিকদের প্রতি এত বেশী মনোযোগী না হওয়ার কথা বলা হচ্ছেঃ আপনি ভবিষ্যতে] কখনও এরূপ করবেন না। (কেননা) কোরআন (নিছক একটি) উপদেশবাণী। (আপনার দায়িত্ব কেবল প্রচার করা)। অতএব, যে ইচ্ছা করবে সে একে কবুল করবে। (যে কবুল করবে না, তার কারণে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। এমতাবস্থায় আপনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? অতঃপর কোরআনের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যে) এটা (অর্থাৎ কোরআন লওহে মাহ্‌ফুযের) সম্মানিত, (অর্থাৎ পছন্দনীয় ও মকবুল) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন (কেননা, লওহে মাহ্‌ফুয আরশের নিচে অবস্থিত) পবিত্র সহীফাসমূহে লিখিত আছে (দুর্মতি শয়তান সেখানে পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ্ বলেনঃ لَا يَمَسُّهُ

إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ মহৎ ও পূতঃ চরিত্র লিপিকারদের (অর্থাৎ ফেরেশতাগণের) হস্তে।

[এসব গুণ জ্ঞাপন করে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র কিতাব। লওহে-মাহফূযে একই বস্তু। কিন্তু এর অংশসমূহকে সুহুফ (সহীফাসমূহ) বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফেরেশতাগণকে লিপিকার বলা হয়েছে। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র আদেশে লওহে মাহ্‌ফুয থেকে লিপিবদ্ধ করে। আয়াতসমূহের সারমর্ম এই যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উপদেশবাণী। আপনি উপদেশ শুনিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবেন—কেউ ঈমান আনুক বা না আনুক। সুতরাং এ ধরনের

অগ্রাধিকার দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর কাফিরদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে যে] মানুষ (অর্থাৎ কাফির মানুষ, যারা এহেন উপদেশবাণী দ্বারা উপকৃত হয় না, যেমন আবূ জাহ্ল প্রমুখ। তারা) ধ্বংস হোক। সে কত অকৃতজ্ঞ! (সে দেখে না যে) আল্লাহ্ তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন, (অর্থাৎ তুচ্ছ বস্তু) শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) সুপরিমিত করেছেন, অতঃপর তার (বের হওয়ার) পথ সহজ করেছেন। (সেমতে এমন অপ্রশস্ত জায়গা দিয়ে এমন সুঠাম শিশুর নির্বিঘ্নে বের হয়ে আসা আল্লাহ্র ক্ষমতা ও শক্তিমত্তাই জ্ঞাপন করে)। অতঃপর (বয়স শেষ হলে) তার মৃত্যু ঘটান এবং কবরস্থ করেন। এরপর যখন আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র এসব কর্ম প্রমাণ করে যে. মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের অধীন এবং তাঁর নিয়ামত ভোগ করে। সুতরাং তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর প্রতি ঈমান আনা জরুরী ছিল। কিন্তু) সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি এবং তিনি যে আদেশ করেছিলেন, তা পূর্ণ করেনি। অতএব, মানুষ (তার সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করার পর বেঁচে থাকা ও আরাম-আয়েশ করার উপকরণাদির প্রতি লক্ষ্য করুক। উদাহরণত সে) তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, (যাতে তা কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য ও ঈমান আনার কারণ হয়। অতঃপর লক্ষ্য করার নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে যে) আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, এরপর ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খর্জুর, ঘন উদ্যান, ফল ও ঘাস। (কিছু) তোমাদের ও (কিছু) তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (এগুলো নিয়ামত ও কুদরতের প্রমাণ। এগুলোর প্রত্যেকটি কৃতজ্ঞতা ও ঈমান দাবী করে, অতঃপর উপদেশ কবূল না করার শাস্তি ও কবূল করার সওয়াব উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ এখন তো তারা অকৃতজ্ঞতা ও কুফর করে) অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, (অর্থাৎ কিয়ামত শুরু হবে, তখন সব অকৃতজ্ঞতার মজা টের পেয়ে যাবে। অতঃপর সেদিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে) সেদিন (উপরে বর্ণিত) মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা, মাতা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে। (অর্থাৎ কেউ কারও প্রতি দরদ দেখাবে না, যেমন অন্য আয়াতে আছে لَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا——কারণ) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে অপর থেকে নির্লিপ্ত রাখবে। (অতঃপর মু'মিনদের ও কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন (ঈমানের কারণে) উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল হবে এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন কুফরের কারণে, ধূলি ধূসরিত হবে। তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফির, পাপাচারীর দল। (কাফির বলে ভ্রান্ত বিশ্বাসী এবং পাপাচারী বলে ভ্রান্ত কর্মী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নুযূলে বর্ণিত অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে-মকতুম (রা)-এর ঘটনায় ইমাম বগভী (র) আরও রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) অন্ধ হওয়ার কারণে একথা জানতে পারেন নি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) অন্যের সাথে আলোচনারত আছেন।

তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আওয়ায দিতে শুরু করেন এবং বারবার আওয়ায দেন।---(মাযহারী) ইবনে কাসীরের এক রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোরআনের একটি আয়াতের পাঠ জিজ্ঞেস করেন এবং সাথে সাথে জওয়াব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মক্কার কাফির নেতৃবর্গকে উপদেশ দানে মশগুল ছিলেন। এই নেতৃবর্গ ছিলেন ওতবা ইবনে রবীয়া, আবূ জাহ্ল ইবনে হিশাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পিতৃব্য আব্বাস। তিনি তখনও মুসলমান হন নি। এরূপ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা)-র এভাবে কথা বলা এবং আয়াতের ভাষায় ঠিক করা মামুলী প্রশ্ন রেখে তাৎক্ষণিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, আবদুল্লাহ্ (রা) পাক্কা মুসলমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তার এই জওয়াব বিলম্বিত করার মধ্যে কোন ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না। এর বিপরীত কোরায়েশ নেতৃবর্গ সব সময় মজলিসে আগমন করতো না এবং যে কোন সময় তাদের কাছে তবলীগও করা যেত না। এ সময়ে তারা মনোনিবেশ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করছিল। ফলে তাদের ঈমান আনা আশাতীত ছিল না। তাদের কথাবার্তা কেটে দিলে ঈমানের আশাই সুদূরপরাহত ছিল। এ ধরনের পরিস্থিতির কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা)-কে আমল দেন নি এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তিনি কাফির নেতৃবর্গের সাথে কথাবার্তা অব্যাহত রাখেন। অতঃপর মজলিস সমাপ্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কর্ম-পদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করে তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই কর্মপদ্ধতি নিজস্ব ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, যে মুসলমান কথাবার্তায় মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধ পন্থা অবল-ম্বন করে, তাকে কিছু হুঁশিয়ার করা দরকার, যাতে সে ভবিষ্যতে মজলিসের রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখে। এ কারণে তিনি আবদুল্লাহ্র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এছাড়া কুফর ও শিরক বাহ্যত সর্ববৃহৎ গোনাহ্। এর অবসানের চিন্তা আগে হওয়া উচিত। আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা) তো ধর্মের একটি শাখাগত বিষয়ের শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিলেন মাত্র কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ইজতিহাদকে সঠিক আখ্যা দেন নি এবং হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি ধর্মীয় শিক্ষার প্রত্যাশী হয়ে প্রশ্ন করেছিল, তার জওয়াবের উপকারিতা নিশ্চিত, আর যে বিরুদ্ধবাদী, কথা শুনতেও নারাজ, তার সাথে কথা বলার উপকারিতা অনিশ্চিত। অতএব অনিশ্চিতকে নিশ্চিতের উপর কিরূপে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়? এটা সত্যি যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা) মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন কিন্তু কোরআন أَعْمَى -শব্দ ব্যবহার করে তাঁর ওযর বর্ণনা করে দিয়েছে যে, তিনি অন্ধ ছিলেন। তাই দেখতে সক্ষম ছিলেন না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এখন কি কাজে মশগুল আছেন এবং কাদের সাথে কথাবার্তা হচ্ছে। সুতরাং তিনি ক্ষমার্হ ছিলেন এবং বিমুখতা প্রদর্শনের পাত্র ছিলেন না। এ থেকে জানা যায়

যে, কোন অপারক ব্যক্তির দ্বারা অজ্ঞাতসারে মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা নিন্দার্হ হবে না।

عَبَسَ وَتَوَلّٰى—প্রথম শব্দের অর্থ রুষ্টতা অবলম্বন করা এবং চোখে-মুখে বিরক্তি প্রকাশ করা। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটা মুখোমুখি সম্বোধন করে উপস্থিত পদবাচ্য দ্বারা এসব কথা বলার স্থান ছিল। কিন্তু তা না করে কোরআন পাক অনুপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করেছে। এতে ভর্ৎসনার স্থলেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, কাজটি যেন অন্য কেউ করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এরূপ করা আপনার পক্ষে সমীচীন হয়নি। পরবর্তী وَمَا يُدْرِيكَ (আপনি কি জানেন?) বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওযরের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, আপনার মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হয়নি যে, সাহাবীর জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উপকারিতা নিশ্চিত এবং কাফিরদের সাথে আলোচনার উপকারিতা অনিশ্চিত। এ বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্যের পরিবর্তে উপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করার মধ্যেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে। কেননা, যদি কোথাও উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা না হত, তবে সন্দেহ হতে পারত যে, এই কর্মপদ্ধতি অপছন্দ করার কারণেই মুখোমুখি সম্বোধন বর্জন করা হয়েছে। এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য অসহনীয় কষ্টের কারণ হত। সুতরাং প্রথম বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয় বাক্যে উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা---উভয়টির মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে।

لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى—অর্থাৎ আপনি কি জানেন, এই সাহাবী যা জিজ্ঞাসা করছিল, তা তাকে শিক্ষা দিলে সে তদ্দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে পারত কিংবা কমপক্ষে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে প্রাথমিক উপকার লাভ করতে পারত। ذكرى-শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌কে বহুল পরিমাণে স্মরণ করা।---(সিহাহ্)

এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে— يزكى ও يذكر— প্রথমটির অর্থ পাক-পবিত্র হওয়া এবং দ্বিতীয়টির অর্থ উপদেশ লাভ করা। প্রথমটি সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্‌ভীরুদের স্তর। যারা নফ্‌সকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার নোংরামি থেকে পাক-সাফ করে নেয় এবং দ্বিতীয়টি ধর্মের পথে চলার প্রথম স্তর। কারণ, যে আল্লাহ্‌র পথে চলা শুরু করে, তাকে আল্লাহ্‌র স্মরণে নিয়োজিত করা হয়- -যাতে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও ভয় তার মনে উপস্থিত থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, এই সাহাবীকে শিক্ষা দিলে তাতে এক না এক উপকার হতই---প্রথমটি, না হয় দ্বিতীয়টি। উভয় প্রকার হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। ---(মাযহারী)

প্রচার ও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কোরআনী মূলনীতি ঃ এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে একই সময়ে দু'টি কাজ উপস্থিত হয়—১. একজন মুসলমানকে শিক্ষা দান ও তার মনস্তুষ্টি বিধান এবং ২. অমুসলমানদের হিদায়তের দিকে মনোযোগ। কোরআন পাকের ইরশাদ একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, প্রথম কাজটি দ্বিতীয় কাজের অগ্রে সম্পাদন করতে হবে এবং দ্বিতীয় কাজের কারণে প্রথম কাজে বিলম্ব করা অথবা ত্রুটি করা বৈধ নয়। এ থেকে জানা গেল যে, মুসলমানদের শিক্ষা ও সংশোধনের চিন্তা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা থেকে অধিক গুরুত্ববহ ও অগ্রণী।

এতে সেসব আলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ রয়েছে, যারা অমুসলমানদের সন্দেহ দূরীকরণ এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার খাতিরে এমন সব কাণ্ড করে বসেন, যদ্দ্বারা সাধারণ মুসলমানদের মনে সন্দেহ-সংশয় অথবা অভিযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের উচিত এই কোরআনী দিক নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানদের সংরক্ষণ ও অবস্থা সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আকবর এলাহাবাদী মরহুম চমৎকার বলেছেন ঃ

بے وفا سمجھیں تمھیں اھل حرم اس سے بچو
دیر والے کج ادا کھدیں یہ بدنامی بھلی

পরবর্তী আয়াতসমূহে কোরআন পাক এ বিষয়টিই পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার ও আপনার ধর্মের প্রতি বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করছে, আপনি তার চিন্তায় মশগুল আছেন যে, সে কোনরূপে মুসলমান হোক। অথচ এটা আপনার দায়িত্ব নয়। সে মুসলমান না হলে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্মের জ্ঞান অন্বেষণে দৌড়ে আপনার কাছে আসে এবং সে আল্লাহ্‌কে ভয়ও করে, আপনি তার দিকে মনোযোগ দেন না। এতে সুস্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষা সংশোধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পাকাপোক্ত মুসলমান করা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী। এর চিন্তা অধিক করা উচিত। অতঃপর কোরআন যে উপদেশবাণী এবং উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ঃ صحف—বলে লওহে মাহ্ফুয বোঝানো হয়েছে। এটা যদিও এক বস্তু কিন্তু সমস্ত ঐশী সহীফা এতে লিখিত আছে বলে একে বহুবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। مرفوعة-বলে এর উচ্চমর্যাদা বোঝানো হয়েছে এবং مطهر ঃ-বলে বোঝানো হয়েছে যে, নাপাক মানুষ, হায়েয ও নেফাসওয়ালী নারী এবং অযুহীন ব্যক্তি একে স্পর্শ করতে পারে না।

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ঃ—سفرة ঃ-শব্দটি سافر এর বহুবচন হতে পারে। অর্থ

হবে লিপিকার। এমতাবস্থায় এই শব্দ দ্বারা ফেরেশতা কেরামুন-কাতেবীন অথবা পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের ওহী লেখকগণকে বোঝানো হবে। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র)-এর তফসীর।

سفرة-শব্দটি سفير-এর বহুবচনও হতে পারে। অর্থ দূত। এমতাবস্থায় এর দ্বারা দূত ফেরেশতা, পয়গম্বরগণ এবং ওহী লেখক সাহাবায়ে কিরামকে বোঝানো হয়েছে। আলিমগণও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কেননা তাঁরাও রসূলুল্লাহ্ (সা) ও উম্মতের মধ্যবর্তী দূত। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিরা'আতে বিশেষজ্ঞ কোরআন পাঠকও এই আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। আর যে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ নয় কিন্তু কষ্টে-সৃষ্টে কিরা'আত শুদ্ধ করে নেয়, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে, কিরা'আতের সওয়াবও কষ্ট করার সওয়াব। এ থেকে জানা গেল যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অনেক সওয়াব পাবে।—(মাযহারী)

অতঃপর মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব নিয়ামত ভোগ করে, সেসব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও অনুভূত বিষয়। সামান্য চেতনাশীল ব্যক্তিও এগুলো বুঝতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথমে مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ বলে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, হে মানুষ, চিন্তা কর, আল্লাহ্ তোমাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নের জওয়াব নির্দিষ্ট---অন্য কোন জওয়াব হতেই পারে না। তাই নিজেই জওয়াব দিয়েছেন ঃ مِنْ نُطْفَةٍ—অর্থাৎ মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ—অর্থাৎ কেবল বীর্য থেকে মানুষকে সৃষ্টিই করেন নি বরং তাকে সুপরিমিতও করেছেন। তার গঠনপ্রকৃতি, আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, গ্রন্থি, চক্ষু, নাক, কান ইত্যাদি এমন সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটু এদিক-সেদিক হলে মানুষের আকৃতিই বিগড়ে যেত এবং কাজকর্ম দুরূহ হয়ে যেত।

قَدَّرَهُ-শব্দের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, মানুষ যখন মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হতে থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চারটি বিষয়ের পরিমাণ লিখে দেন। ১. সে কি কি কাজ করবে এবং কিরূপে করবে, ২. তার বয়স কত হবে, ৩. কি পরিমাণ রিযিক পাবে এবং ৪. পরিণামে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা হবে।---(বুখারী, মুসলিম)

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহস্য বলে মাতৃগর্ভের তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এবং সংরক্ষিত জায়গায় মানুষকে সৃষ্টি করেন। যার গর্ভে এই সৃষ্টিকর্ম চলে, সে নিজেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানে না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার অপার

শক্তিই এই জীবিত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষের মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে আসার পথ সহজ করে দেয়। চার-পাঁচ পাউণ্ড ওজনের দেহটি সহীসালামতে বাইরে চলে আসে এবং মায়েরও এতে তেমন কোন দৈহিক ক্ষতি হয় না।

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ—নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করার পর পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যু ও কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কোন বিপদ নয়—নিয়ামত। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ মৃত্যু মু'মিনের জন্য উপঢৌকনস্বরূপ। এর মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। فَاَقْبَرَهٗ অর্থাৎ অতঃপর তাকে কবরস্থ করেছেন। বলা বাহুল্য, এটাও এক নিয়ামত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় যেখানে মরে সেখানেই পচে গলে যেতে দেন নি বরং তাকে গোসল দিয়ে পাক-সাফ কাপড় পরিয়ে সম্মান সহকারে কবরে দাফন করে দেওয়া হয়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, মৃত মানুষকে দাফন করা ওয়াজিব।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهٗ—এতে অবিশ্বাসী মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র উপরোক্ত নিদর্শনাবলী ও নিয়ামতরাজির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর বিধানাবলী পালন করা। কিন্তু হতভাগ্য মানুষ তা করেনি। অতঃপর মানবসৃষ্টির সূচনা ও পরিসমাপ্তির মাঝখানে যেসব নিয়ামত মানুষ ভোগ করে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের রিযিক কিভাবে সৃষ্টি করা হয়? কিভাবে আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়ে মাটির নিচে চাপাপড়া বীজকে সজীব ও সতেজ করে তোলে। ফলে একটি সরু ও ক্ষীণকায় অংকুর মাটি ভেদ করে উপরে উঠে। অতঃপর তা থেকে হরেক রকমের শস্য, ফল-মূল ও বাগ-বাগিচা সৃষ্টি হয়। এসব নিয়ামত সম্পর্কে মানুষের বারবার অবহিত করার পর পরিশেষে আবার কিয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ—صَاخَّة এমন কঠোর নাদ; যার ফলে মানুষ শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলে। এখানে কিয়ামতের হট্টগোল তথা শিংগার ফুঁক বোঝানো হয়েছে।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ— এখানে হাশরের ময়দানে সকলের সমাবেশের দিন বোঝানো হয়েছে। সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। দুনিয়াতে যেসব আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কারণে মানুষ একে অপরের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন

দিতে কুণ্ঠিত হয় না, হাশরে তারাই নিজ নিজ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হবে যে, কেউ কারও খবর নিতে পারবে না বরং সামনে দেখলেও মুখ লুকাবে। প্রত্যেক মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে—পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে ফিরবে। দুনিয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভ্রাতাদের মধ্যে হয়। এর চেয়ে বেশী পিতামাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশী স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর হাশরের ময়দানে মু'মিন ও কাফিরের পরিণতি বর্ণনা করে সূরার ইতি টানা হয়েছে।
